প্রথম অধ্যায়

লেখিকা সত্তার হওয়া আর হয়ে ওঠা

"আশার চিঠিখানি খুব ভালো লাগল। এতে ওর বুদ্ধিশক্তির যে উজ্জ্বলতা নির্ভীকতা ও যে সত্যপরায়ণতা প্রকাশ পেয়েচে সেটা বিস্ময়জনক। তারুণ্যের স্পর্ধা অনেকেরই দেখি কিন্তু চিত্তবৃত্তির দৈন্যে চিন্তাশক্তির অগভীরতায় তাদের চাঞ্চল্য নিতান্ত ছেলেমানুষী হয়ে ওঠে। আশার মননশক্তির মধ্যে অসাধারণতা আছে..."[১]

রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এমন অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা আশালতার লেখনপদ্ধতি, বুদ্ধিশক্তির প্রশংসা করেছেন। আশালতা তৎকালীন সময় থেকেও অত্যন্ত প্রাগ্রসর 'চিন্তাশক্তি' ও 'আধুনিক মননশীলতার' অধিকারিণী ছিলেন। বাংলা সাহিত্য জগতে আশালতার আত্মপ্রকাশ বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে যখন ব্রিটিশরা কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে এর ফলস্বরূপ বঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এরূপ চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম লেখিকা আশালতা জন্মগ্রহণ করেন, বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরে ১৯১১ সালের ১৫ জুলাই, বাংলা ১৩১৮ সালের ৩০ আষাঢ়, শনিবার কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন—

"বিহারের ভাগলপুর শহরে আমার জন্ম (?) শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম জীবনের বিহারভূমি। এই শহরটি তাই চিরদিনই আমার কাছে গভীর স্বপ্ন এবং গম্ভীর বাস্তব একাধারে।"[২]

আশালতার পিতা ছিলেন দক্ষ আইনজীবী তথা শিল্প-সাহিত্যপ্রেমী যতীন্দ্রমোহন সরকার ও মাতা ছিলেন যোগমায়া দেবী। যতীন্দ্রমোহন ও যোগমায়া দেবীর সাত পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে আশালতা জ্যেষ্ঠ। আশালতার পিতামহ

সুপ্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী চন্দ্রশেখর সরকার। ভাগলপুরের খঞ্জরপুর অঞ্চলে চন্দ্রশেখর সরকারের তৈরি 'বড়োবাড়ি' নামে পরিচিত বাড়িতে আশালতা বড় হচ্ছিলেন। চন্দ্রশেখর সরকারের বাঁকুড়াতে বিস্তৃত জমিদারি ছিল। বাঁকুড়ায় তিনি পুজোর ছুটি কাটাতে পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে যেতেন।

> *"সেখানে তাঁর বেড়াবার জন্য একটি হাতি ছিল। সেই হাতির পিঠে হাওদা চড়িয়ে আশালতাকে নিয়ে তিনি বিকেলে রোজ বেড়াতে যেতেন।"*[৩]

এছাড়া যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গেও ৮-৯ বছর বয়সে আশালতা 'মটর গোদায় ডুংরির জমিদারি' দেখতে গিয়েছেন। এসব বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে ঘিরেই আশালতার সাহিত্য সৃষ্টি। বিভিন্ন জায়গার এসমস্ত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আশালতা লিখেছিলেন— 'ছোট-ছোট ভ্রমণ কাহিনী'।

সাহিত্যের প্রতি আশালতার আসক্তি বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত। পিতামহ চন্দ্রশেখর সরকার আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও শিল্প ও সাহিত্য জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। উল্লেখ্য যে, চন্দ্রশেখর ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ১৯১০ সালে। বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় সে সময় ভাগলপুরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ সম্পর্কে আশালতা লিখেছেন—

> *"ভাগলপুর কমলাসনা বাণীর বিশেষ কিছু আশীর্বাদ রয়েছে বইকি। কারণ আমরা ছোট থেকে সেখানে দেখে আসছি অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের। অমর কথাসাহিত্যিক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি ভট্ট, নিরুপমা দেবী, গিরিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন*

মজুমদার বহু সাহিত্যিকের বহু সাহিত্যকর্ম এই ভাগলপুরেই সৃজন হয়েছে।"[৪]

চন্দ্রশেখর সরকারের আগ্রহে এই ভূমিতেই অভিনীত হয় 'বিশ্বমানে' নাটক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নাটকে 'চিন্তামণি' এবং রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার 'পাগলিনী' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অন্যদিকে পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার যেমন সাহিত্যনুরাগী ছিলেন তেমনি শিল্পকলার অঙ্গনে অবাধগতিতে তাঁর বিচরণও ছিল। তিনি 'গান গাইতেন', 'সেতার বাজাতেন', এমন কি 'ছবিও আঁকতেন'। পিতা যতীন্দ্রমোহন আশালতার মধ্যদিয়ে তাঁর মনের সব কল্পনা ও আকাঙক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। পিতা যতীন্দ্রমোহনের সান্নিধ্য ও আগ্রহে আশালতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল শিল্প ও সাহিত্য চেতনা।

সেকালের সমাজব্যবস্থায় নারীদের জন্য কেবল নির্ধারিত ছিল নিয়মনীতির বন্ধনে আবদ্ধ অন্তঃপুর। বর্হিজগতে মেয়েদের যাতায়াতে ছিল নিষেধাজ্ঞা। এমনকি, শিক্ষার্জনে মেয়েদের অধিকার ছিল না। 'পর্দাপ্রথা' বা অবরোধ নামে পুরুষপ্রধান সমাজের নির্ধারিত রীতির জন্য মেয়েদের মুক্ত আকাশের নিচে শ্বাস নেওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। 'সতীদাহ প্রথা'র জন্য নারীদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। রক্ষণশীল সমাজের এরূপ নানা নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী যতীন্দ্রমোহন আশালতাকে তৈরি করতে চাইলেন নিজের মতো করে। ঘরবন্দী না করে যতীন্দ্রমোহন প্রায়ই আশালতাকে সভা-সমিতি সহ বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতেন। এর পেছনে যতীন্দ্রমোহনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সভা-সমিতিতে আগত গুণীব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আশালতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তাঁদের নানা শিক্ষামূলক কথন যা তাঁর চলার পথের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। তাঁর জীবনের এসব বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই সাহিত্যসৃজনে রসদ যুগিয়েছে। যতীন্দ্রমোহন তৎকালীন সমাজনীতিকে উপেক্ষা করে প্রথাগত বিদ্যার্জনে মেয়েকে শুধু সুযোগই করে দেননি, বইয়ের প্রতি আসক্তি সৃষ্টিতেও তিনি

ছিলেন উদ্যোগী। আশালতাকে স্পষ্টভাবে বলতে শোনা যায়—

> *"শুধু বই আর বই। আমি বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসতাম। বই পেলে আমি যেন সব ভুলে যেতাম।"*[৫]

যতীন্দ্রমোহন ভাগলপুর ইনস্টিটিউট নামে ক্লাবের লাইব্রেরি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ইংরেজি-বাংলার অসংখ্য বই সংগ্রহ করে এনে দিয়ে আশালতার 'গ্রন্থক্ষুধা' মেটাতেন। এই বইগুলি অধ্যয়নের ফলে আশালতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে আশালতা বলেছেন—

> *"বাবা যখন ক্লাবে যেতেন ইংরেজি বই গাদাগাদা আমি তাঁকে দিয়ে আনাতাম ইনষ্টিট্যুটের লাইব্রেরী থেকে, অমূল্য রায়কে ঠাট্টা করে বাবা বলতেন, নামও আমার মনে থাকে না আর ঐসব গাদা-গাদা বই আমার মেয়ে পড়ে। চন্দ্রশেখর হলে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে আমাকে উৎসবে মানপত্র দিয়েছিল তখন সব বন্ধুরা ও সভাপতি সকলে মিলে সবচেয়ে মোটা মালাটা বাবার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ মালা তাঁরই প্রাপ্য। উনিই নিজের বাড়িতে কত যত্ন করে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিয়ে মেয়েকে মানুষ করেছেন। মালা ওঁর গলায় আগে দাও।' ..."*[৬]

শুধু তাই নয়, আশালতার বই পড়ার প্রশংসা করে বুদ্ধদেব বসুকেও বলতে শোনা যায়—

"আশালতা সাহিত্যপ্রাণ মানুষ। তাঁর গদ্যের বাঁধুনি সুন্দর, মতামত স্পষ্ট, প্রকাশভঙ্গীতে কুণ্ঠা নেই। নতুন এবং নতুনতর বই তিনি নিত্য পড়ে থাকেন, কিন্তু 'লুচি ভাজতে-ভাজতে পড়ে ওঠা যায়' এমন বই তিনি পড়েন না; তাঁর আগ্রহ গভীরতার দিকে।"[৭]

যতীন্দ্রমোহন কন্যাকে বাঁকুড়ার বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়ানোর পর মোক্ষদা গার্লস স্কুলে ভর্তি করেন। রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরে পিতার নামানুসারে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয় এবং মাতা মোক্ষদাদেবীর স্মৃতিতে 'মোক্ষদা গার্লস স্কুল' স্থাপন করেন। আশালতা এই মোক্ষদা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। আশালতার শিল্পী ও লেখিকা হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে এই মোক্ষদা গার্লস স্কুলের ভূমিকা ছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মামা সুরেন্দ্রনাথ মোক্ষদা গার্লস স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পর হেডমিস্ট্রেসের ঘরে কয়েকজন ছাত্রীদের বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্য পড়াতেন। আশালতা জানান—

"প্রায় প্রতিদিন ছুটির পর সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের হেডমিস্ট্রেস মণিদির ঘরে এসে আমাকে পড়াতেন শেলী স্কাইলার্ক, কীট্‌সের 'ওড্ টু গ্রীসিয়ান আর্ন'। সাহিত্যের বিষয়ে ইংরেজি এবং বাংলা— কত কি বুঝিয়ে দিতেন। এক কথায় আমরা এঁচড়ে পেকেছিলাম। তবু মনে হয় আমাদের দিনে শিক্ষার মান কত গভীর কত সত্য ছিল।"[৮]

আশালতা এই ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কিন্তু মেধা তালিকায় সব থেকে এগিয়ে ছিলেন। বলেছেন—

"ঐ পাঠ সভার কনিষ্ঠতম এবং সবচেয়ে দরদী সদস্যা

ছিলাম আমি।"[৯] *(অপ্রকাশিত ডায়ারি)*

আশালতা মোক্ষদা গার্লস স্কুলে অধ্যয়নকালেই শেলী, কীট্‌স, বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পড়তেন। এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে তাঁর লেখা অপ্রকাশিত ডায়ারিতে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার সুবাদে ব্যক্তিজীবনেও ব্যাপক প্রভাব নজরে পড়ে। আশালতা জানিয়েছেন—

> *"সুরেনবাবু নিজের হাতে ইংরেজী সাহিত্যের রসে আমাদের অভিষিক্ত করেছিলেন। তাঁর অধ্যাপনার গুণে বাণীর কুঞ্জের ঘন মন্থর সৌরভ আমাদের আকুল করে তুলত। আমার বয়স তখন বারো বা তেরো বছর। ... অথচ সে যুগের সেই আদর্শ শিক্ষকেরা ছেলেমানুষ বলে অবজ্ঞা করেননি। টফি খেতে বা খাটো স্কার্ট পরে খুকী সেজে থাকতে বলেন নি; বরঞ্চ সাহিত্যের নন্দন বনের পারিজাতগুলি আমাদের স্পর্শের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন।"*[১০]

লক্ষণীয় যে, আশালতা শুধু বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাহিত্যজগতেও অবাধ সঞ্চরণ ছিল তাঁর। পিতার সাহচর্যে সংগীতের জগতেও বিচরণ করতে লাগলেন তিনি। উল্লেখ্য যে, সংগীত জগতে আশালতা যাদেরই সান্নিধ্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন তাঁরা কোনো না কোনোভাবে সকলেই সাহিত্যের সঙ্গে ছিলেন জড়িত। পরবর্তী সময়ে লেখিকা হয়ে ওঠার পেছনে তাদেরই সংস্পর্শ আশালতাকে প্রাণিত করেছে। ভাগলপুরের মজুমদার পরিবারের ছেলে রাজেন্দ্রনাথের এক ভাই মণি মজুমদারের কাছে আশালতা ও যতীন্দ্রমোহন ছবি আঁকা শিখতেন, আর গান শিখতেন অন্য আরেক ভাই যার নাম ছিল রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। আশালতা অপ্রকাশিত

ডায়েরিতে লিখেছেন—

"এক্সসাইজ কমিশনার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার গায়ক হিসেবে ভারতবর্ষে বিখ্যাত ছিলেন ... কত গান যে তাঁর শুনেছি— কত গান তাঁর কাছে শিখেছি।"

অসাধারণ কণ্ঠস্বরের জন্যে তাঁর কাছে হার মানতে হত। তিনি ধ্রুপদ, টপ্পা, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গান শুনে মোহিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তবে তিনি সুরের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য জগতের সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন। এ সময়ে তাঁর লেখা হাস্যরসাত্মক গল্প বই আকারে প্রকাশিত হয়। আশালতার পিতৃগৃহে সান্ধ্য গানের আসরে প্রত্যেক দিনই তিনি যোগ দিতেন। এছাড়াও আশালতা ভাগলপুরের রায় পরিবারের কাছ থেকেও সঙ্গীত শিখেছেন। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের আইন বিভাগের অধ্যাপক হরেন্দ্রলাল রায়ের মেজো ছেলে হেমেন্দ্রলাল ও ছোটো ছেলে রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছেও আশালতা সঙ্গীত শিখতেন। হরেন্দ্রলাল আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লিখতেন, মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সভাপতি পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে হেমেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রলাল সে সময় ভাগলপুরের সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। উভয়েই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে উপজীব্য করে বাংলা ও ইংরেজিতে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হেমেন্দ্রলাল রায়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রলাল রায়ের কন্যা মালবিকা কানন জানিয়েছেন—

"আদমপুরের বাড়ির বিরাট গ্রন্থাগারে হেমেন্দ্রলাল নানা বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। যখন ভাগলপুরে বুঢ়ানাথ শিব মন্দিরের কাছে বড় বাসায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন, হেমেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, রাত্রি বেলায় বড় বাসার ছাদে বসে দুজনে প্রায়ই আড্ডা দিতেন। দুজনে এক সঙ্গে কাজরাভ্যালিতে বেড়াতেও গিয়েছিলেন।"[১১]

আশালতা গানের জগতেও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভাগলপুরের সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রত্যেকবার পরীক্ষা দিয়ে 'সোনার মেডেল পেতেন'। গানের জগতের প্রসিদ্ধ গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও দিলীপকুমারের সান্নিধ্য-সহযোগিতার কথা স্বীকার করে বলেছেন—

"তখন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত যে ঘাটে ডিঙি বাঁধতেন সেখানে গিয়ে আমরা গঙ্গার ধারে দিলীপকুমারের ও প্রসিদ্ধ গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গান শুনেছি। শুধু শোনা নয়— শিখেছি এবং রীতিমত উপভোগ করেছি।"[১২]

ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছেও আশালতা গান শিখেছিলেন, পেশায় ছিলেন তিনি আইনজীবী। পরবর্তী সময়ে যদিও তিনি আইনব্যবসা ছেড়ে সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মামা। তিনি 'বিচিত্রা' ও 'গল্পভারতী' নামে দু'টি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সন্ধ্যার সময় আশালতার পিতৃগৃহে যে গানের আসর বসত সেখানে তিনি নিত্য যাওয়া-আসা করতেন। আশালতা তাঁর কাছ থেকে শিখতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, আর উপেন্দ্রনাথকে শেখাতেন দ্বিজেন্দ্রগীতি। সে সময় ভাগলপুরের গানের জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন আশালতা।

"শহরে যেখানে যত গানের জলসা, স্টীমার পার্টি

বা উৎসবাদি হত, গান গাইবার জন্য আর সেতার বাজানোর জন্য সর্বাগ্রে আশালতার নিমন্ত্রণ হত।" [১৩]

অতএব বলা যেতে পারে যতীন্দ্রমোহনের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা এবং বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের সংস্পর্শই আশালতার সঙ্গীতপ্রীতির সঙ্গে সাহিত্যপ্রীতি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়স্থল ছিল ভাগলপুরেই। সময়ের গতিতে সমাজ ও সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, আর এই পরিবর্তনের স্রোত সাহিত্য জগতেও প্রবাহিত হয়। তাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতেও 'নারীর প্রেম', 'করুণা', 'ত্যাগ', 'সমর্পণে'র দৃশ্য অঙ্কিত হয়। শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনের প্রভাব ছিল আশালতা সিংহের লেখনীতেও। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আশালতার পিতামহ চন্দ্রশেখর সরকারের খঞ্জরপুরের খোলার বাড়িতে ভাড়া নেন। খঞ্জরপুরের একটি বিশাল বাংলা ছিল, যা 'ফেলুবাবুর বাগানবাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। সেই বাড়িই বাংলা সাহিত্য জগতের খ্যাতনামা লেখিকা নিরুপমা দেবীর বাসভূমি ছিল। শরৎচন্দ্র সেখানেই দিনের পর দিন কাটাতেন। অপ্রকাশিত ডায়ারিতে আশালতা লিখেছেন—

"ছোটবেলায় আমরা এসব গল্প শুনতাম আর বড় বড় চোখে দূর দিগন্তে চেয়ে কত স্বপ্নের জাল বুনতাম। সকাল-বিকাল একবার করে ঐ বাড়িতে ঘুরে আসতাম— সেই তাঁর বাঁশি বাজানো মসজিদের ছাদে চাঁদের আলোয় বসে থাকতাম।" [১৪]

শরৎচন্দ্র তাঁর সুহৃদ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভার সদস্যরূপে নিরুপমা দেবী[১৫], উপেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়[১৬] প্রভাত মুখোপাধ্যায়[১৭], বিভূতিভূষণ ভট্ট[১৮], সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়[১৯] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। 'আজকের যোধন' পত্রিকায় 'আশালতা সিংহের বিশেষ সংখ্যা'য় লিখিত ড০ ইরা ঘোষালের প্রবন্ধ থেকে এ প্রসঙ্গে জানা যায়—

> ***"The meeting of the Sabha was held at the residence of the Gangulies of Bengalitola' (Saratchandra's meteral uncle's house, where he was brought up and the reminiscences of which have found place in his famous book. Srikanta by a few youngman of literary pursuits."***[২০]

আশালতার লেখিকা সত্তা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভাগলপুরের এই সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশই সহায়ক ভূমিকা নেয়। এ প্রসঙ্গে আশালতা নিজেই বলেছেন—

> *"ভাগলপুর শহরটি তখন সাহিত্য-সঙ্গীতে-বৈদগ্ধ্যে চারুকলায় একেবারে টইটুম্বুর। আর সেই মহা সরস্বতীর মর্মস্থানে আমরা সব মধুলোভী ভ্রমরের দল আসর জমাতে পেরেছিলাম ঐ অত অল্প বয়সেই।"*[২১]

আশালতা সিংহের সাহিত্যজীবনের প্রস্তুতিলগ্নে হরেন্দ্রলাল রায়ের ছোটভাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুপুত্র দিলীপকুমারের সহযোগিতা চিরস্মরণীয়। সুরেন্দ্রনাথ দিলীপকুমারের মামা ছিলেন। দিলীপকুমার ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম য়ুরোপ ভ্রমণ করে দেশে ফিরে এসে প্রায়ই ভাগলপুরে মামার বাড়িতে গানের

আসরে যোগদান করতে আসতেন। অপ্রকাশিত ডায়ারিতে আশালতা লিখেছেন—

"দিলীপকুমার প্রথমবার য়ুরোপ ঘুরে এসে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে গানের সুর সভায় সুর ও গানের আলোচনা করতে প্রায়ই ভাগলপুরে আসতেন এবং ঐ বিদগ্ধ সুর সভায় কখনো স্টিমারে কখনো গঙ্গা তীরের মনোরম পরিবেশে কখনো মালবিকা কাননের পিতা রবীন্দ্রলাল রায়ের বাড়িতে আমারও ডাক পড়তো। আমি তখন মালবিকা কাননের পিতা রাগ নির্ণয় গ্রন্থের গ্রন্থকার রবীন্দ্রলাল রায় ও জ্যেষ্ঠতাত হেমেন্দ্রলাল রায়ের কাছে গান শিখতাম।"[২২]

দিলীপকুমার কলকাতায় হোমিওপ্যাথী ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে থাকতেন। তিনি য়ুরোপ থেকে এসে (১৯২২) এখানে গানের আসর শুরু করেন। 'স্মৃতিচারণের দ্বিতীয় পর্বে দিলীপকুমার লিখেছেন—

"আমি গান গেয়ে নানা মনীষী মহাত্মা দিকপালকে থিয়েটার রোডে ডাকতাম— সবাই পুলকিত হতেন তাঁদের শুভাগমে। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বীরবল, সুভাষ, সত্যেন, মেঘনাদ, ধূর্জটি আরো অনেক বাঙালি ও অবাঙালি মনীষী থিয়েটার রোডে এসে আসর জমাতেন।"[২৩]

আশালতা যখন কলকাতায় মামার বাড়িতে যেতেন তখন তিনি দিলীপকুমারের এই গানের আসরে যোগ দিতেন। দিলীপকুমারের এই বাড়ির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন—

"সে বাড়িতেই আমার সঙ্গে অনেকের আলাপ

হয়েছিল। ধূর্জটি প্রসাদ, অতুলপ্রসাদ, বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু— সকলেই আমাকে স্নেহ করতেন, আমার লেখা ভালোবাসতেন।"[২৪]

উল্লেখ্য যে, ১৯২৭ সালে দিলীপকুমার পুনরায় য়ুরোপ ভ্রমণ করতে গিয়ে আশালতার জন্য সেখান থেকে বইয়ের পার্সেল পাঠান। আর আশালতা সে সব বইয়ের পৃষ্ঠার প্রত্যেক লাইন শুধু মন দিয়ে পড়তেনই না, জীবনে চলার পথে এই বইগুলো তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে, তাঁর লেখিকা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। পিতার ছত্রচ্ছায়ায় আশালতা সিংহের প্রতিভা যখন প্রস্ফুটিত হওয়ার পথে সেই সময় বিয়েকে কেন্দ্র করে আশালতার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। যতীন্দ্রমোহন সমাজের বিভিন্ন নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে মেয়েকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তুললেও প্রচলিত সমাজ রীতিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাই তো তেরো বছর কয়েকমাস বয়সে বীরভূমের সংরক্ষণশীল জমিদার বংশের সন্তান অবিনাশচন্দ্র সিংহের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয় আশালতার অনিচ্ছায়। আশালতা বলেছেন—

"আমার পিতৃগৃহ উদার এবং আধুনিক হলেও তাঁরা বিদ্রোহী ছিলেন না। সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের যাবার উপায় বা অভিপ্রায় কোনটাই ছিল না। তাই তেরো বছর কয়েক মাস মাত্র বয়সে আমার বিয়ে হল বীরভূমের একান্ত রক্ষণশীল সুপ্রাচীন জমিদার বংশে।"[২৫]

আশালতার সঙ্গে যখন দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের বিয়ে হয় তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ আর.জি. কর মেডিকেল কলেজের চতুর্থবর্ষের ছাত্র। তাই আশালতার কখনো পিত্রালয় ভাগলপুরে কখনো বা শ্বশুরালয় বাতিকারে যাতায়াত লেগে থাকত।

রক্ষণশীল শ্বশুরালয় মেয়েদের পড়াশুনা ও সঙ্গীতচর্চা পছন্দ করতেন না। এরূপ পরিবেশের সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্ক স্বাধীনচেতা আশালতার মানিয়ে চলতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। আশালতা যখন ভাগলপুর থেকে শ্বশুরালয়ে আসতেন তখন তাঁকে নানা ফন্দী ফিকির করে, লুকিয়ে-চুড়িয়ে ঘরের ফাঁক-ফোকর কাপড় দিয়ে বন্ধ করে পড়তে হত। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন তিনি—

> *"ধরা পড়লে ওরা বিদ্রূপ করত বলে যখন বাতিকারে থাকতাম তখন দরজা-জানালা বন্ধ করে বই পড়তাম। ওরা খড়খড়ি ফাঁক করে পাছে আমাকে দেখে ফেলে বলে আমি কাগজ কি ন্যাকড়া দিয়ে সব ফাঁক বুজিয়ে দিতাম।"*[২৬]

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিয়ের কয়েকদিন পর ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করে কিছুকাল সিউড়িতে প্র্যাকটিস করেন, এরপর ভাগলপুরের আদমপুর অঞ্চলে গিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। আশালতা জানিয়েছেন—

> *"আমার যখন ১৪/১৫ বছর মাত্র বয়স। কত যুগ আগেকার কথা। আমার পূর্বাশ্রমের স্বামী ড০ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ (স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি) তখন সবেমাত্র ডাক্তারি পাশ করে সিউড়ীতে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। সোহাড়া পাড়ায় একটি ছোট্ট বাড়িতে আমরা থাকি। ... এর কিছুদিন পরেই আমরা পিতৃগৃহে ভাগলপুরে চলে এলাম। ভাগলপুরে আমার স্বামী ডাক্তারী শুরু করলেন।"*[২৭]

যতীন্দ্রমোহনই আশালতা-দ্বিজেন্দ্রনাথের থাকার বন্দোবস্ত করে দেন স্ত্রী

যোগমায়া দেবীর নামে নির্মিত 'মায়ালজে'। দ্বিজেন্দ্রনাথের চেম্বারে যাতায়াতের জন্য যতীন্দ্রমোহন টমটম গাড়িও দেন। আশালতা পুনরায় স্থায়ীভাবে ভাগলপুরে আসতে পেরে, নিজেকে আবার সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে যুক্ত করেন। সে সময় যতীন্দ্রমোহন আশালতার 'শিক্ষার জন্য' নিযুক্ত করেন তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যাপকবৃন্দদের। এ প্রসঙ্গে আশালতা বলেছেন—

> *"আমার বাপের বাড়ি মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি এবং তাদের উন্নতির জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। তা নইলে বিয়ের পরেও তাঁরা এত খরচ করে আমাকে এত লেখাপড়া শেখাবেন কেন।"*[২৮]

ষোল বছর দশ মাস বয়সে আশালতার লেখিকা সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯২৭ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ আশালতার পিত্রালয়ে গিয়ে তাঁর সমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত সকল পাণ্ডুলিপি তুলে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ এসব লেখা দেখে দিলীপকুমারকে পত্রযোগে জানান—

> *"আশা খুব ছেলেমানুষ, লেখা এখনও দানা বাঁধেনি, তবে* ***Seat is there.****"*[২৯]

দিলীপকুমার আশালতার লেখালেখি 'ভারতবর্ষে' ছাপান। 'ভারতবর্ষ' (১টি প্রবন্ধ) ও 'বিচিত্রা' (২টি প্রবন্ধ) এই দু'টি পত্রিকায় আশালতার 'নারী' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধের আত্মপ্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পড়ে আশালতাকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এটি 'নারীর মনুষ্যত্ব' নামে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৯৩৫ সালে আশালতা ভাগলপুর ছেড়ে স্থায়ীভাবে দুবরাজপুরে চলে আসেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেখানে চেম্বার খুলেছিলেন। এ অবস্থায় আশালতার বাতিকার-দুবরাজপুরে আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। এসময় বেরিবেরিতে আক্রান্ত

আশালতার ছোট দেওরের মৃত্যু হয়। আশালতার শ্বশুর-শাশুড়ী দ্বিজেন্দ্রনাথকে আর ভাগলপুরে থাকতে দিতে রাজী হলেন না। অপ্রকাশিত ডায়েরিতে আশালতা জানিয়েছেন—

> *"আমার সবচেয়ে ছোট দেওর ডাক্তারি পরীক্ষার ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ি এসে হার্টের বেরিবেরিতে সহসা মারা গেলেন। তখন আমার স্বামীকে তাঁর শোকার্ত পিতামাতা বিহার প্রবাসী হয়ে থাকতে আর অনুমতি দিলেন না। তাঁদের একান্ত ইচ্ছায় তিনি ভাগলপুর হতে চলে এসে বাড়ির নিকটে দুবরাজপুরে প্র্যাকটিস শুরু করলেন।"*[৩০]

লেখা সম্পর্কিত শরৎচন্দ্রের উপদেশ এসময়ে সাহিত্যিক আশালতার লেখার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নেয়। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

> *"অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের ওপরেই হোক্ বা নারীর ওপরেই হোক।"*

> *"... তাই বয়স কম থাকতেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময় দেখেচি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও সঙ্কোচ বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না ক্রিটিকও থাকে। বয়সের*

সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশী বয়সে লেখক যখন লিখতে চায় ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান বিদ্যেবুদ্ধি দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে ওঠুক রসের দিক দিয়ে তার তেমন ত্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ করে দিয়ে যে ব্যক্তি রস সৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো উপন্যাস বলো। আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্ছে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা বৃথা।"[৩১]

এরপর থেকেই আশালতা প্রবন্ধ সাহিত্য থেকে কথাসাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। গল্পকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে 'সমর্পন' গল্পটির মাধ্যমে। গল্পটি 'উত্তরা' পত্রিকায়, ফাল্গুন ১৩৩৫ এ প্রকাশিত হয়। আশালতা একের পর এক গল্প লিখে যান। তাঁর লেখনীর স্টাইল নিয়ে পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। 'শনিবারের চিঠি'তে আশালতাকে নিয়ে একের পর এক সমালোচনা প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেমন—

(ক) *"যে ন্যাকামি আর কুৎসিত কুরুচি অতি আধুনিক সাহিত্যের বিশেষত্ব, তাহার সঙ্গে সকলেরই অল্প বিস্তর পরিচয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অতি-আধুনিক লেখিকার মূর্তি একদিন আমরা ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই।"*[৩২]

এমনকি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ও আশালতাকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখেন। 'আশাহতা' নামে লিখিত তাঁর একটি কবিতার শেষ স্তবকটি এরকম—

"ওগো ও ডালিম ফুল
কে ঘটালো তব জীবন— কাব্যে
এমন ছন্দ ভুল
তোমার গভীর বেদনার কথা
বুঝেছি বুঝেছি ওগো আশাহতা
তোমার লাগিয়া এখনও কাননে
কাঁদিতেছে বুলবুল
কণ্ঠভরা সে সঙ্গীত তার
বিরহ— বেদনাকুল।" [৩৩]

রক্ষণশীল শ্বশুরালয়ের পুত্রবধূ হিসেবে তাঁকে যে এসব কিছুকে কেন্দ্র করে অনেক কিছুই সহ্য করতে হত, তা সহজেই বোধগম্য। আশালতা সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন—

"কোন-কোন পত্রিকা আমাকে হীন আক্রমণ করে
বিদ্রূপ সমালোচনা করত— আমার শ্বশুরবাড়িতে তা
নিয়ে কথা উঠত।" [৩৩]

কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতাই সাহিত্যিক আশালতাকে তার অভীষ্ট থেকে সরাতে পারেনি। নারীর প্রতিভা বিকাশের পথকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে আশালতা একের পর এক গল্প-উপন্যাস রচনা করে গেছেন।

১৯৩৯ সালে শ্বশুর অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যুর পর জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব এসে পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের ওপর। সে সুবাদে আশালতাকে জমিদারি দেখাশোনা করতে হত। পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের দায়বদ্ধতায় লেখালেখির সুযোগ ও সে সময় কমে গিয়েছিল। তথাপি অল্পস্বল্প লিখে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু এক সময় সুযোগ ও সময়ের অভাবের জন্য লেখনীর জগত থেকে নিজেকে

পুরোপুরিভাবে গুঁটিয়ে নিলেন তিনি। আশালতা লিখেছেন—

> *"আবার সেই নিরানন্দ, অন্ধকারাগার। কোথাও সঙ্গ নেই, সাহিত্যের আবহাওয়া নেই, আর হয়ত এক আধ বছর লিখেছিলাম তারপর আমার লেখা বন্ধ হয়ে গেল।"*[৩৫]

এই দশ বছরের সাহিত্য জীবনের মধ্যে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ— সবকিছুই লিখেছেন আশালতা। আশালতার রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নন্দকুমার রায় বলেছিলেন—

> *"তিনি প্রচলিত রীতির অনুসরণ না করিয়া বিশ্লেষণ ধার্মিক দিকে ঝুকিয়াছেন। একটা স্বচ্ছ সাংস্কৃতিক দীপ্তিকে সনাতন জীবনাদর্শের একটি বিচ্যুতি অন্য দিকে বর্তমান বাস্তবতার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটা তাঁহার রচনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।"*[৩৬]

হওয়া আর হয়ে ওঠার বিরামহীন এক গতির মধ্যে আশালতার সৃষ্টি সম্ভার আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় অজানা, অদেখা এমন এক প্রতিভাকে এমন এক সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে যিনি নবজাগ্রত নারীসমাজের সামনে এক বিপুল বিস্ময়, এক বিরাট প্রেরণা—

> *"আমি নারী, আমি মহীয়সী..."*

উল্লেখসূত্র :

১. দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশ নব্বর চিঠি, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩, পৃঃ ২৫

২. সন্তোষ মজুমদার ও মায়া ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আশালতা সিংহ রচনাবলী', বিহার বাঙলা আকাডেমি, মার্চ ১৯৯০, পৃঃ **XXXiX**

৩. আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক (আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ, শম্পা সিনহা, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১২, জয়শ্রী প্রেস, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃঃ ৩৩

৪. দ্র. আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক (আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ), পৃঃ ৩৩

৫. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পূর্বপত্র, এস.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, জুলাই ১৯৬৩, পৃঃ ২০৯

৬. দ্র. আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক (আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ), পৃঃ ৩৬

৭. আমার যৌবন, বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ১৯৭৭, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলকাতা- ৭৩, পৃ: ৬৭

৮. দ্র. সন্ন্যাসিনী আশাপুরী : 'কল্লোলযুগ' পর্দার আড়াল থেকে, শারদীয় কথাসাহিত্য, কার্তিক ১৩৮৮, পৃঃ ৬১

৯. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, ভূমিকা অংশ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৬, পৃঃ ৯

১০. দ্র. আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক (আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ), পৃঃ ৩৫

১১. মালবিকা কানন ২০০৫ সালের ১০ এপ্রিল একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়— অভিযাত্রিক, বিভূতি রচনাবলী ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৮৫, পৃঃ ৪১৬-২৬

১২. দ্র. সন্ন্যাসিনী আশাপুরী : 'কল্লোলযুগ', 'পর্দার আড়াল থেকে', শারদীয় কথাসাহিত্য, পৃঃ ৬১

১৩. দ্র. আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক (আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ), পৃঃ ৩৫

১৪. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন— (১) ভূমিকা অংশ, পৃঃ ১৩

১৫. গল্পকার, ঔপন্যাসিক। জন্ম— ১৮৮৩ সালে

১৬. লেখক, জন্ম— ১৮৮৩ সালে

১৭. গল্পকার, জন্ম— ১৮৭৩ সালে। দেবী, আদরিণী, মাতৃহীন ইত্যাদি গল্প তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

১৮. গল্পকার, নিরুপমাদেবীর ভাই।

১৯. ভারতী পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং সম্পাদনাও করেছিলেন একাধিক দফায়। তাঁর গল্প সংকলনগুলোর নাম হল— শেফালি, নির্ঝর, পুষ্পক, মৃণাল, প্রভৃতি।

২০. আজকের যোধন- ২৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই- আগস্ট ২০১০, আশালতা সিংহের বিশেষ সংখ্যা, প্রবন্ধ- ভাগলপুরে সাহিত্য- সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল রাজমুকুট— স্বর্ণিকা আশালতা), ড০ ইরা ঘোষাল, পৃঃ ৩৭

২১. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন (১) ভূমিকা অংশ, পৃঃ ১৩

২২. দ্র. ঐ, পৃঃ ১১

২৩. দিলীপকুমার রায়, স্মৃতিচারণ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটড পাবলিশিং কোং,

দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৬৫, পৃঃ ৪৮০

২৪. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়— পূর্বপত্র, এস.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, জুলাই ১৯৬৩, পৃঃ ২১২

২৫. সন্নাসিনী আশাপুরী : 'কল্লোল যুগ', পর্দার আড়াল থেকে, শারদীয় কথা সাহিত্য, কার্তিক ১৩৮৮, পৃঃ ৬১-৬২

২৬. দ্র. ঐ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়— পূর্বপত্র, পৃঃ ২১৪-২১৫

২৭. দ্র. সন্ন্যাসিনী আশাপুরী : রূপান্তরে মা, শ্রী সত্যানন্দ মানসকন্যা- শ্রী অর্চনাপুরী মা, শ্রী সত্যানন্দ দেবায়তন, ৭ শ্রাবণ ১৪০০, পৃঃ ৩২

২৮. দ্র. ঐ, সন্ন্যাসিনী আশাপুরী : 'কল্লোল যুগ', পর্দার আড়াল থেকে, পৃঃ ৬০

২৯. দ্র. ঐ. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পূর্বপত্র, পৃঃ ২১২

৩০. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, পৃঃ ৫৭

৩১. দ্র. দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশ নম্বর চিঠি, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩, পৃঃ ১০২-১০৩

৩২. দ্র. সংবাদ সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৪০, পৃঃ ১৯৬-১৯৭

৩৩. দ্র. আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক (আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ), পৃঃ ৫৮

৩৪. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পূর্বপত্র, পৃঃ ২১৪

৩৫. দ্র. আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক (আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ), পৃঃ ৬১

৩৬. দ্র. আজকের যোধন, পৃঃ ৩৪